ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 212–223
www.athenajournalcbm.in

বাংলায় আয়ুর্বেদের রূপান্তরের ধারা

শুভঙ্কর কুণ্ডু*

প্রাপ্ত: ১৬.১০.২০২৪ পরিমার্জন: ১৫.০৩.২০২৫ গৃহীত: ২৫.০৪.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *মানুষের দেহে অসুখ-বিসুখ কোনো নতুন বিষয় নয়। আমাদের দেশে ঋগবৈদিক যুগ থেকেই মানুষের দেহে রোগের প্রতিকারের কথা জানা যায়। এর আগে মানুষ রোগ সারানোর জন্য শুধুই মাতৃশক্তি কিংবা প্রকৃতির কাছে প্রার্থনার ওপরই বিশ্বাস করত। ঋগবেদের একটি অংশ হিসেবে আয়ুর্বেদের কথা আমরা প্রথম জানতে পারি। বৈদিক যুগ থেকেই রোগ সারানোর জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, তা হলো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি। সেই দিক থেকে ধরলে প্রায় তিনহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে এই চিকিৎসাব্যবস্থা। বর্তমানেও এই চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা রোগ নির্ণয় ও তার নিরাময় হয়ে আসছে। কিন্তু, তিন হাজার বছর ধরে কী এর কোনো পরিবর্তন হয়নি! একই ধারাবাহিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে এই চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত! নিশ্চয়ই না। আজ আমরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থার যে রূপ দেখতে পাই, তা একদিনের কথা নয়। এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থার ইতিহাসটিকে। প্রাচীন ভারতে কিভাবে এই চিকিৎসাব্যবস্থা চালু হলো, পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকালীন পথ পেরিয়ে কিভাবে ঔপনিবেশিক আমলে নবজাগরণের সামনে পড়ল এবং সবশেষে বর্তমানে আয়ুর্বেদের কি অবস্থা সেটিই আলোচনা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *আয়ুর্বেদ, চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগ, শিক্ষা, দেশীয়, পশ্চিমি, ইংরেজ, পরম্পরা।*

*প্রাক্তন এম.ফিল. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া।
e-mail: shubhankar1996kundu@gmail.com

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কাল, তাকে আয়ু বলে। এই আয়ু চার প্রকার—হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ ও দুঃখায়ু। এই চতুর্বিধ আয়ু এবং আয়ুর হিতকর ও অহিতকর সমস্ত বিষয়, আয়ুর পরিমাণ ও স্বরূপ নির্ণয় যে শাস্ত্রে বলা আছে, তাকে আয়ুর্বেদ বলে।[১] বলা হয়—অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্র বলতে যা বোঝায়, আয়ুর্বেদ বলতে তা বোঝায় না। মনুষ্য জীবনের যা কিছু কর্মময় বা ধর্মময় ব্যাপার এক কথায় মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সিদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ আরোগ্যের অশেষবিধ উপায়, উপদেশ ও অনুষ্ঠান সকল এই আয়ুর্বেদে নিহিত আছে।[২] অর্থাৎ বলা যায় যে আয়ুর্বেদ হলো জৈবিক বিজ্ঞান। প্রাচীন ভারতকে জানার প্রধান সাহিত্যিক উপাদান হলো বেদ, যার চারটি ভাগ হলো—ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। আয়ুর্বেদ ছিল ঋকবেদেরই একটি অংশ বিশেষ। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে, 'বেদ অপৌরুষেয়'। সুতরাং, সেদিক থেকে আয়ুর্বেদও অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনো পুরুষ নির্মিত নয়।[৩] ঋষি কশ্যপ আয়ুর্বেদকে পঞ্চমবেদ আখ্যা দিয়েছেন।[৪] আয়ুর্বেদের উৎপত্তি নিয়ে প্রচলিত মতটি হলো— জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোকময়ী আয়ুর্বেদীয় সংহিতা রচনা করেছিলেন, যার নাম ব্রহ্মসংহিতা। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ সেই সংহিতা অধ্যয়ন করে যে গ্রন্থ করেছিলেন, তা হলো দক্ষসংহিতা। দক্ষ প্রজাপতির শিষ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় গুরুর কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা হলো অশ্বিনীকুমার সংহিতা। দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অধ্যয়ন শেষে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা হলো বাসব সংহিতা বা ঐন্দ্র সংহিতা।[৫] ইন্দ্রের পর আর কোনো দেবতা পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায় না। মর্ত্যলোকে যখন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, তখন ঋষি-মহর্ষিরা হিমালয়ের পাদদেশে চৈত্ররথ নামক স্থানে এক মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। সেখানে তাঁরা যজ্ঞ ও ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ আছে, যা পেলে তাঁরা রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। স্বর্গে গিয়ে আয়ুর্বেদ আনার ভার ঋষিগণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে দেন। মহর্ষি ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে মর্ত্যে নিয়ে এলে, মর্ত্যে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরদ্বাজ তাঁর যে ছ'জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, তাঁরা হলেন—অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি।[৬] তাঁরা সকলেই 'কায় চিকিৎসা'কে (Practice of Medicine) প্রধান করে আয়ুর্বেদচর্চা করেছিলেন বলে, তাঁদের সম্প্রদায়কে বলা হতো কায় চিকিৎসক সম্প্রদায় বা School of Physicians।

মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ এনে প্রজাদের হিতার্থে মর্ত্যে আয়ুর্বেদের প্রচার করেছিলেন, তেমনই কাশিরাম দিবদাস ধন্বন্তরিও ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে লোকহিতার্থে বারানসীধামে আয়ুর্বেদের প্রচার করেছিলেন। আয়ুর্বেদে অদ্বিতীয় কুশলতার জন্য তিনি 'সমুদ্র মন্থন সমুদ্ভুত দেবতা' বলে পরিচিত। তিনি তাঁর যে ছ্য়জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন— সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র, পুষ্কলাবত, বৈতরণ ও ভোজ।[৭] তাঁরা সকলেই ধন্বন্তরির কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে শস্ত্রচিকিৎসা-প্রধান আয়ুর্বেদের প্রবর্তন করেন, এই জন্য তাঁদের শল্য চিকিৎসক সম্প্রদায় বা ধন্বন্তরি সম্প্রদায় (School of Surgeons) বলা হতো।

মানুষের দেহের আটটি ভাগ নিয়ে আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল বলে, আয়ুর্বেদকে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ' বলা হতো। 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ'-এর আটটি ভাগ হলো—১. শল্যতন্ত্র (Surgery) বা শস্ত্রসাধ্য রোগসমূহের চিকিৎসা। এর অন্তর্গত ছিল প্রসূতিতন্ত্র (Midwifery)। ২. শালক্যতন্ত্র বা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠস্থল প্রভৃতির চিকিৎসা (Diseases of the eye, ear, nose & throat)। ৩. কায়চিকিৎসা বা ঔষধসাধ্য সাধারণ রোগ সমূহের চিকিৎসা (Practice of medicine)। ৪. ভূতবিদ্যা বা যাবতীয় মানসরোগ সমূহের নিদান ও প্রতিকার (Treatment of mental diseases)। ৫. কৌমারভৃত্য বা শিশুপালন ও শিশু চিকিৎসা (Diseases of the children)। ৬. অগদতন্ত্র বা বিষচিকিৎসা (Treatment of toxicology)। ৭. রসায়নতন্ত্র বা বার্ধক্যব্যাধিসকলের প্রতিকার (Treatment of health & longevity)। ৮. বাজিকরণতন্ত্র বা স্ত্রীপুরুষের যৌনরোগসমূহ (যা এখানে 'প্রজনন শক্তির রোগ' বলে আখ্যাত) (Treatment of Sexual diseases)।[৮]

আত্রেয় (ভাবপ্রকাশ মতে ভরদ্বাজই আত্রেয়) সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ছাড়াও আরও একটি সম্প্রদায়ের কথা জানতে পারা যায়, তা হলো—রসবৈদ্য সম্প্রদায়। রস, পারদ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ নিয়ে চর্চা করায়, এই সম্প্রদায় 'রসবৈদ্য সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ছিল। মনে করা হয়, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন মহাদেব। সিদ্ধ নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমনাথ, গোবিন্দ, নাগার্জুন ছিলেন এই সম্প্রদায়ের রসশাস্ত্রবিদ। বৌদ্ধযুগে এই সম্প্রদায় এদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৯]

প্রাচীন ভারতে মানুষ ভয় পেত প্রকৃতিকে। প্রকৃতির যেকোনও কার্যকলাপকে তারা অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ এর পিছনে ঈশ্বরের হাত আছে বলে মনে করত। বজ্রবিদ্যুৎ, খরা, বন্যাকে তারা মনে করত তাদের ওপর ঈশ্বরের রুষ্ট হবার ফল। একই ধারণা ছিল অসুখ বিসুখের পেছনেও। মহাদেব রুষ্ট হলে জ্বর হয়, শনিদেবের দৃষ্টি পড়লে শরীর খারাপ হয় বলে মনে করা হতো। মানুষ খাদ্য হিসেবে যেমন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তেমনি রোগের হাত থেকে সেরে উঠতেও গাছপালার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। কৌষিকীসূত্রে রোগের কারণ হিসেবে বায়ু-পিত্ত-কফ এই ত্রিধাতুর নাম পাওয়া যায়।[১০] মনে করা হতো দেহে এই তিনটির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধিই ছিল রোগের মূল কারণ। রোগের কারণ নিয়ে যারা প্রাচীন ভারতে চর্চা করতেন, এরূপ দুটি গোষ্ঠীর কথা আমরা জানতে পারি। বহু বছর পর্যন্ত আমরা চরক ও সুশ্রুতকে কেবল দুজন ব্যক্তি হিসেবেই জেনে এসেছি। অনেক সময় আমরা এদের সময়কালকেও নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিয়েছি। যাঁরা মনে করেন চরক একজন ব্যক্তি, তাঁদের মতে, তিনি ছিলেন কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজবৈদ্য।[১১] কিন্তু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, চরক কিংবা সুশ্রুত কেউই ব্যক্তি ছিলেন না, এটি ছিল আসলে দুটি গোষ্ঠী। 'চরক' শব্দের অর্থ যাঁরা ঘুরে বেড়াত বা ভ্রাম্যমাণ এবং 'সুশ্রুত' শব্দের অর্থ যাঁরা ভালো করে শুনতে পারত।[১২] আমরা জানি যে, রোগ সারাতে গেলে সবার আগে রোগকে নির্ণয় করা জরুরী। এই দুই গোষ্ঠীর প্রধান কাজ ছিল এটিই। বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার লিখিত রূপ ছিল চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা। চরক সংহিতা ছিল মূলত ভেষজ চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ফসল, অপরদিকে শল্য চিকিৎসার গ্রন্থ ছিল সুশ্রুত সংহিতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল, যে মানুষগুলি রোগ সারাতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতেন, তাঁদের প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, 'ভিষক ও শল্যবিদ খুবই ঘৃণার পাত্র। এদের ছোঁয়া পাপ, এদের দেওয়া অন্ন রক্তপুঁজের মতো ঘৃণ্য। এদের উপস্থিতিতে শ্রাদ্ধবাড়ির পবিত্রতা পর্যন্ত নষ্ট হয়'।[১৩] যজুর্বেদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'ভিষক বা চিকিৎসাবিদ হলেন অপবিত্র'।[১৪]

প্রাচীন ভারতে রোগ সারাতে যে চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োগ করা হতো তা হলো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিদ্যা। এই চিকিৎসা বিদ্যার লক্ষ্য ছিল দুটি—প্রথমত, 'স্বসস্য স্বাস্থ্য রক্ষণম' অর্থাৎ সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, 'আতুরস্য বিকার প্রশমনন চ' অর্থাৎ অসুস্থের চিকিৎসা করা।[১৫] এই চিকিৎসাবিদ্যা বংশপরম্পরায় গুরুশিষ্য বা পিতাপুত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ফলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার কোনো অধিকার সমাজের সব স্তরের মানুষের ছিলনা।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ ভারতবর্ষে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে ব্রিটিশ শাসনের সূচনার আগে সুলতানদের হাত ধরে ইউনানি চিকিৎসাব্যবস্থার প্রচলন হয় এদেশে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি হলো ভারতে আগত প্রথম বিদেশী চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত গ্রীক, মিশরীয়, পারসিক ও চৈনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত।[১৬] নানান দেশ ঘুরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখার সঙ্গে নিজেদের পরিচয় ঘটিয়ে আরবীয় পণ্ডিতেরা এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। আরবরা রাজ্যজয় ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগে নানান দেশে গেলে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতিরও বিস্তার ঘটে। আব্বাসিদ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বইগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল। এসময় ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে বইগুলি অনুবাদ করা হয়েছিল, সেগুলো হলো চরক সংহিতা (শারাক), সুশ্রুত সংহিতা (সমরদ), অষ্টাঙ্গ হৃদয় (অস্তাগার), নিদান (ইয়েদান), সিদ্ধযোগ (সিদ্ধসান) এবং একটি স্ত্রীরোগ বিষয়ক সংস্কৃত

গ্রন্থ রুশা নামে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।[১৭] ঔরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বে ঔরঙ্গজীবী নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে আয়ুর্বেদের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[১৮] সুলতানি এবং পরবর্তীকালে মোগল শাসনকালে আয়ুর্বেদচর্চা কিছুটা হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একথা বলা যাবে না। কারণ, এই সময় সরকারি ও বেসরকারিভাবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ধারা অব্যাহত ছিল। যাঁরা এই ভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কনিষ্ঠ বাগভট্ট, ডল্লন, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস, তরুণ দত্ত, বিজয় রক্ষিত, ইন্দু, বাচস্পতি, আটমল্ল ও ভবমিশ্র। এদের মধ্যে ভবমিশ্র ছিলেন প্রতিভাবান আয়ুর্বেদ পণ্ডিত।[১৯]

তবে, শাসকদের পক্ষ থেকে যে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি খুব সদর্থক মনোভাব প্রকাশ পেত এমন নয়। আয়ুর্বেদের প্রতি মোগল শাসকদের উদাসীনতাকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'Passive neglect of Ayurveda'[২০] অর্থাৎ 'আয়ুর্বেদকে পরোক্ষ অবহেলা' বলে মন্তব্য করেছেন। সুলতানি এবং মোগল যুগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অবক্ষয়ের কারণ ছিল, ইউনানির মতো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করা। ফলে আয়ুর্বেদ তার স্বাভাবিক গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পলাশির যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের জয়লাভের পর সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই ব্রিটেন থেকে সিভিলিয়ান এবং সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের ভারতে আসা বেড়ে গেল। কিন্তু, এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হওয়ায় তাদের মধ্যে নানান অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি ভারতে ইংরেজদের কবরখানায় গিয়ে সমাধিসৌধে ফলকের লেখা পড়লে জানা যাবে কত কম বয়সে কত ইংরেজ ভারতে কাজ করতে এসে মারা যেতেন। এদেশে এরকম মৃত্যুমিছিলের কথা জানতে পারলে তো ব্রিটেন থেকে কেউ আর এখানে কাজ করতে আসবে না।[২১] এই চিন্তাই ইংরেজ কোম্পানির আধিকারিকদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে। ঠাণ্ডার দেশ ব্রিটেনের থেকে গরমের দেশ ভারতে আসায় তাদের মধ্যে ক্রান্তীয় অসুখ-বিসুখ, চর্মরোগ, পেটের রোগ দেখা দিতে থাকে। ব্রিটেনে এইসব রোগ না হওয়ায়, ইংরেজদের এই রোগগুলোর নিরাময় বা প্রতিরোধ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলনা। তারা তখন ভাবতে শুরু করেন, যে এদেশের মানুষেরা এইসব রোগে আক্রান্ত হন কিনা। যদি হন তাহলে কিকরে তাদের নিরাময় হয়। আর যদি না হন তবে কিকরে তারা সেইসব রোগ প্রতিরোধ করেন। এই ভাবনা থেকেই ইংরেজরা দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। এর মধ্যে আয়ুর্বেদও ছিল।

প্রাচীন যুগ থেকেই তো মানুষের অসুখ হতো। রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে তারা চিকিৎসাও করত। কিন্তু কিভাবে এই চিকিৎসা করা হতো, অর্থাৎ কোন গাছের পাতা, শিকড় বা মূল কতটা পরিমাণে লাগবে তা শুধুই জানতেন বৈদ্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এই জ্ঞান আবদ্ধ থাকত কেবল বৈদ্যের পরিচিত মহলের (সন্তান, শিষ্য) মধ্যে। তাইতো রামায়ণে দেখি লক্ষ্মণের রোগ সারাতে বিশল্যকরণী আনতে হনুমানকে বলা হলে, হনুমান গাছ না চেনায় গোটা গন্ধমাদন পাহাড়টাই তুলে এনেছিলেন।[২২] সুতরাং, জ্ঞান আবদ্ধ হয়ে থাকায় নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাইরে তা জানার উপায় ছিলনা। কিন্তু, শুধু রোগ সারলেই তো হবেনা, প্রয়োজন তার নথিকরণও। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো পার্থক্যের জায়গা। উনিশ শতকেও প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানকে যেখানে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেখানে পশ্চিমি জ্ঞানকে মুক্ত করা হয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা বললে, দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগ সারানোর ক্ষেত্রে যেখানে শুধু গাছটির কথা বলে, সেখানে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কোন অসুখে আমরা গাছটির কোন অংশকে ব্যবহার করে ওষুধ তৈরি করব এবং তা আমাদের শরীরে কীভাবে রোগ নিরাময় করবে সে কথাও বলে। সুতরাং, শুধু রোগ সারাটাই নয়, রোগ কীকরে সারল তাও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ইংরেজরা এদেশে এসে ঠিক এই কাজটাই করেছিল। ভারতের সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এদেশের সম্পদ সম্পর্কে জানতে ও তার খোঁজ শুরু করতে এদেশের দেশীয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিল।

প্রথমে রোগ সারানোটাই ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পদ্ধতিটা নয়। কর্মচারীদের রোগ সারাতে দেশীয় বৈদ্য, কবিরাজদেরও ডাক পড়ত, এ ব্যাপারে কোম্পানির সরকারের কোনো আপত্তি ছিলনা। কারণ তারা আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাইতো দেখা যায় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রের পাশাপাশি দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানোর জন্য আবেদন করা হলে সংস্কৃত কলেজ কমিটির সভাপতি ডা. হোরেস হেম্যান উইলসন এবং নেটিভ মেডিক্যাল কলেজের পরিচালক ডা. টাইটলার এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্লাস শুরু করেন। যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, ডেভিড হেয়ারের মতো ব্যক্তিরা। সেখানে মাত্র সাতজন ছাত্র নিয়ে খোলা হয় 'বৈদ্যক বিভাগ', যার দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষুদিরাম বিশারদকে। তিনি মাসিক ষাট টাকা বেতনে সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেন।[২৩] তাঁর ক্লাসেরই দুই কৃতী ছাত্র ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত এবং নবকৃষ্ণ গুপ্ত। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে পশ্চিমি চিকিৎসার প্রবর্তনের ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানিমহলে বিতর্কের সৃষ্টি হলে, সেই প্রসঙ্গে টাইটলার লিখেছিলেন, 'আয়ুর্বেদে অনেক জ্ঞানগর্ভ তথ্য আছে, কোথাও আয়ুর্বেদের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির মিল নাই, তথাপি আমি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ইউরোপীয় চিকিৎসক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভাল চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা আমার বিশ্বাস হয়না। ভারতীয়গণের চিকিৎসা তাহাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত'।[২৪] ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের পরিচালক এ. হুটন তাঁর স্মারক বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছিলেন যে, 'It is a great pleasure to record that Ayurveda dealt with physiology, anatomy, physical examinations and therapeutics and displayed the most surprisingly enterprise in the realm of surgery'.[২৫] অর্থাৎ, এটি নথিভুক্ত করা খুবই আনন্দের যে আয়ুর্বেদ শারীরতত্ত্ব, শারীরসংস্থানবিদ্যা, শারীরিক পরীক্ষা এবং রোগ নিরাময় নিয়ে আলোচনা করে এবং আশ্চর্যজনক উদ্যোগ দেখা যায় অস্ত্রোপ্রচারের ক্ষেত্রে। বরং এই সময় আয়ুর্বেদের কঠোর সমালোচনা করে সেইসময়ের নানান দেশীয় পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছিল। যার সারবক্তব্য ছিল—১. আয়ুর্বেদ একটি অতিপ্রাচীন ও অনুন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান। এর ধ্যানধারণা ও চিকিৎসাপদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন। দীর্ঘদিন এই শাস্ত্রে কোনও গবেষণা না হওয়ায় বা সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কাজে না লাগানোয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা একেবারেই অনুন্নত থেকে গেছে। ২. এই শাস্ত্রে কেবল ত্রিধাতু তত্ত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শারীরতত্ত্ব, শল্যচিকিৎসা মোটেও গুরুত্ব পায়নি। ৩. আয়ুর্বেদের ওষুধ মূলত বনৌষধি নির্ভর, ধাতব এবং খনিজ রসায়ন সে অর্থে গুরুত্ব পায়নি।[২৬] যদিও পরে এই অভিযোগগুলি খণ্ডন করার চেষ্টাও করা হয়। কাঙাল হরিনাথ তাঁর *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*-য় লিখেছিলেন, 'হিন্দুশাস্ত্র পুরাতন, এতে আধুনিক রোগের চিকিৎসা নেই এই ধারণা ঠিক নয়, এটা কুসংস্কার মাত্র'।[২৭] ফলে উনিশ শতক জুড়েই আয়ুর্বেদের পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথাই শোনা গেছিল। তাই ইংরেজরা প্রথম থেকেই যে এই চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল, এটা বলা যায়না। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদ এবং তাঁর দুই ছাত্র সম্পর্কে যে সংস্কৃত শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, পূর্ণচন্দ্র তা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন,

ক্ষুদিরাম বিশারদ খ্যাত ভূমণ্ডলে
আয়ুর্বেদ-মহাসিন্ধু সবে যার বলে।
নবকৃষ্ণ গুপ্ত, গুপ্ত শ্রীমধুসূদন
এই দুই মন্থন দণ্ড দৃঢ় বিলক্ষণ
করিয়া অসীম শ্রম লভে অবশেষে
চরকাদি-সুধারস মনের হরষে।[২৮]

ক্ষুদিরাম বিশারদ সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাদানের কাজে অপারগ হলে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকসনের সভাপতি ডা. হোরে হেম্যান উইলসন মধুসূদন গুপ্তকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষকের আসনে বসে মধুসূদন গুপ্ত শারীরসংস্থানবিদ্যা অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। তিনি এই বিষয়ে হাতেকলমে চর্চাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি হুপারসের অ্যানাটমিস্ট ভাদেমেকম বইটি সংস্কৃতে অনুবাদ করে কর্তৃপক্ষের কাছে সুনাম অর্জন করেন। তখন হিন্দু সমাজের সংস্কারহেতু বাংলায় চিকিৎসাব্যবস্থায় শব ব্যবচ্ছেদ করা হতো না। অথচ প্রাচীন ভারতে যে শব ব্যবচ্ছেদ হতো, তার প্রমাণ মেলে সুশ্রুত সংহিতায়। যেখানে শব ব্যবচ্ছেদ থেকে শুরু করে প্রায় ১২১টি বিবিধরকম যন্ত্রপাতির উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ছিল— মণ্ডলাগ্র (গোল ছুরি), করপত্র (হাতের মতো দেখতে করাত), বৃদ্ধিপত্র (ক্ষুর), নখশস্ত্র (নখের মতো দেখতে শস্ত্র), মুদ্রিকা (আঙ্গুলের মতো ছুরি), অর্ধধার (একদিকে ধার দেওয়া ছুরি), সূচী (ছুঁচ), শররীমুখ (কাঁচী), কুঠারিকা (ছোটো কুঠার), বাড়িশ (বড়শি), এষণি (ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ শলাকা), দণ্ডশঙ্কু (দাঁত তোলার যন্ত্র) ইত্যাদি।[২৯] কিন্তু, পরে এই শব ব্যবচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যায়। শব ব্যবচ্ছেদ করতে যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হতো, তা কখনই শল্যবিদরা নিজেরা তৈরি করতেন না। সেগুলো তৈরি করতেন কামারেরা। যারা কিনা ছিলেন শাস্ত্রের বিচারে নিচু জাতের মানুষ। ফলে তাঁদের ছোঁয়া বা তৈরি করা জিনিস ছুঁলে যে জাত যাবে। শল্য চিকিৎসা করতে গেলে হাত পাকানোর জন্য মরা মানুষের ওপর ছুরি চালাতে হয়। কিন্তু, মড়া তো ডোমেরা ছোঁয়। কামারের তৈরি জিনিস যেখানে ছুঁতে বাধা, সেখানে মড়া ছোঁয়ার কথা তো ভাবাই যায় না। ফলে বন্ধ হয়ে গেল শল্য চিকিৎসা। পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর এ *হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি* (প্রথম খণ্ড ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে হাতের কাজের প্রতি এরকম বিরূপ মনোভাবই যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান অগ্রগতির ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা সেই বর্ণনা করেছেন।[৩০]

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যেখানে যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানো হতো, যেমন— কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ), নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশনে (১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ, এখানেই একমাত্র আয়ুর্বেদ পড়ানো হতো) তাদের শিক্ষাগত মান যাচাইয়ের জন্য সার্জন জন গ্রান্ট, জে.সি. সাদারল্যান্ড, সি.ই.ট্রিভ্লিয়ান, টমাস স্পেন, জোসেফ ব্রামলি ও বাবু রামকমল সেনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। ভাষা নিয়েই মূলত এই কমিটির মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়। একদিকে নেটিভ মেডিক্যাল কলেজের পরিচালক ডা. টাইটলার দেশীয় ভাষায় এবং অপরদিকে আলেকজান্ডার ডাফ ইংরেজিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন।[৩১] কমিটি ডাফের বক্তব্যকে সমর্থন করে ইংরেজি ভাষাতেই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে।[৩২] এর সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বেন্টিক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ সরকারের পক্ষ থেকে এক চিঠিতে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসান'-কে জানানো হলো যে— 'That the medical class of the Sanskrit College of Calcutta and the medical class of the Madrasa both of which institutions are under the control and management of your committee have been abolished from the 1st February and a new institution has been formed and placed under your supervision for communicating medical education to the native youth through the medium of English language'।[৩৩] অর্থাৎ, আপনার অধীনে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল ক্লাস এবং মাদ্রাসার যে মেডিক্যাল ক্লাস রয়েছে, সেগুলি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং আপনার তত্ত্বাবধানেই একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে, যেখানে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশীয় তরুণদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ইংরেজের হাত ধরে ভারতে প্রবেশ করে। বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সোমবার হিন্দুস্কুলের বিপরীতে রামকমল সেনের বাড়িতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এদেশে শব

ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হলেও, পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শব ব্যবচ্ছেদ ছিল শিক্ষার একটি প্রধান বিষয়। মধুসূদন গুপ্ত এবং নবকৃষ্ণ গুপ্ত নামে দুই ছাত্র সেইসময় ছিলেন একই সঙ্গে দেশীয় এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান জানা ব্যক্তি। তাই এদের দুজনকে শুরু থেকেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। নিজের পাণ্ডিত্যের জোরে মধুসূদন এদেশে তো বটেই, বিদেশেও পত্রপত্রিকা আর চিকিৎসা জগতে পরিচিত হয়েছিলেন।[৩৪] তাঁর একান্ত আগ্রহ এবং একইসঙ্গে এদেশে শব ব্যবচ্ছেদকে চালু করতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতেই তুলে দিয়েছিলেন শবব্যবচ্ছেদের ছুরিটি। যার ফল সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ও আয়ুর্বেদচর্চাকারী মধুসূদন গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। মধুসূদন গুপ্ত নিজে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদচর্চা করলেও মেডিক্যাল কলেজে ছুরি দিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করলে চারিদিকে যেন পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের জয়জয়কার হলো। মধুসূদনের সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ামে ৫০টি তোপধ্বনি বেজেছিল।[৩৫] সেদিন থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর পশ্চিমি চিকিৎসাব্যবস্থা যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকল। বাংলায় আয়ুর্বেদচর্চা যারা করতেন, তাঁরা উপলব্ধি করলেন, ইংরেজরা দেশীয় এই চিকিৎসাব্যবস্থার পক্ষে নন।

এই মনোভাব থেকেই আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর পাল্টা-কথা পত্রপত্রিকায় লেখা হতে থাকে। আয়ুর্বেদে শুধুই বনৌষধির বিবরণ লেখা নেই, তার সঙ্গে রসায়নেরও যে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, তা জানানো হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর এ *হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি* গ্রন্থে আয়ুর্বেদে রসায়নের ব্যবহারকে ইয়াত্রো রসায়নের যুগ (৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং তান্ত্রিক রসায়নের যুগ (৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) এই দুভাগে ভাগ করেছেন।[৩৬] ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট কোচের রোগের সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কার চিকিৎসা জগতের এক যুগান্তকারী ঘটনা। পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগের সংক্রমণের কারণ হিসেবে জীবাণুকে গ্রহণ করলেও, আয়ুর্বেদে বায়ু-পিত্ত-কফকেই রোগের মূল কারণ হিসেবে ধরা হতো। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থার সমালোচকদের কাছে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। এর জবাবে কবিরাজেরা *চরক সংহিতার* বিমানস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত 'জনপদোদধ্বংসকারী ব্যাধিগুলির' কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, আয়ুর্বেদে জীবাণুতত্ত্ব কোনো নতুন ধারণা নয়। বহুকাল আগেই কবিরাজেরা বিসূচিকা (Cholera), বিষমজ্বর (Malaria), সান্নিপাতিক (Typhoid), মধুমেহ (Diabetes), বসন্ত (Pox), কুষ্ঠ রোগ (Leprosy) কে সংক্রামিত ব্যাধি বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩৭] অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বিরুদ্ধে এই সময় পাল্টা অভিযোগ আনা হয়। এই চিকিৎসার প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বরে প্রথমদিকে কুইনাইন ব্যবহার করা হলেও, এটি ক্ষতিকর ওষুধ হিসেবে জানার পর থেকে সাধারণ মানুষ আর এর ব্যবহার করতে চাইল না। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সেসময় এদেশের মানুষের মধ্যে অজ্ঞাত ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ একসময় নাকি অমিতা সেনকে (অমর্ত্য সেনের মা) বলেছিলেন, 'অ্যালোপ্যাথি ধরেছিস তো মরেছিস'।[৩৮]

ফলে একদিকে আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাব এবং অপরদিকে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে পাল্টা অভিযোগ করা চলতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার বেশ কিছু আয়ুর্বেদবিদ তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই আয়ুর্বেদচর্চা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু করেন। রোগী দেখার পাশাপাশি তাঁরা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এই চিকিৎসাপদ্ধতির কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। বিশ শতকের শুরুতেই তাঁরা আয়ুর্বেদ হাসপাতাল করে সেখানে রোগী দেখতে শুরু করেন। উনিশ ও বিশ শতকে এই চিকিৎসাপদ্ধতির চর্চা নিয়ে সে সময় বহু লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বলা বাহুল্য যা হয়েছিল এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের একান্ত আগ্রহেই। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আয়ুর্বেদ সভা', যার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ও কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন। বাংলায় আয়ুর্বেদবিদদের অনেকেই পশ্চিমি চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন; এক্ষেত্রে যামিনী ভূষণ রায়, গণনাথ সেনের নাম করা যায়। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে পশ্চিমি চিকিৎসাব্যবস্থার সাহায্য

নিয়েই এই চিকিৎসাব্যবস্থার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এরপর থেকেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় 'শুদ্ধপন্থী' ও 'মিশ্রপন্থী' ধারার উদ্ভব ঘটে। মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর রায়ের 'গঙ্গাধরী' শাখার অনুগামীরা ছিলেন শুদ্ধপন্থী আয়ুর্বেদ ধারার বাহক। অপরদিকে কলকাতার গঙ্গাপ্রসাদ সেনের 'গঙ্গাপ্রসাদী' ধারার অনুগামীরা ছিলেন মিশ্রপন্থী আয়ুর্বেদ ধারার বাহক। এদুটি ধারা ছাড়াও আয়ুর্বেদচর্চার ক্ষেত্রে আরও যে ধারা বা পরম্পরার কথা জানতে পারা যায় সেগুলি হলো 'গুরুকুল কাংড়া পরম্পরা', 'বারানসী পরম্পরা', 'দেহলি পরম্পরা'।[৩৯] বলা বাহুল্য এই পৃথকীকরণ কিছুটা হলেও আয়ুর্বেদচর্চার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। বংশপরম্পরার এই ভাগাভাগিকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। আয়ুর্বেদ পত্রিকায় বলা হয়েছিল, 'আমরা আমাদের ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, আসুন সকলে চরক সুশ্রুতের যুগ ফিরাইয়া আনি'।[৪০] এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ অনেকটাই এগিয়ে এসেছিলেন। আয়ুর্বেদকে পশ্চিমি চিকিৎসার সমান মর্যাদার দাবি জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ দিতে শুরু করেছিলেন— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন পাঁড়ে, ডা. অনাথবন্ধু রায়, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মত ব্যক্তিবর্গ। মূলত এদের উদ্যোগেই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'General Council and State Faculty of Ayurvedic Medicine'। এরপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো 'All Bengal Ayurvedic Conference'।[৪১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন পশ্চিমি চিকিৎসাব্যবস্থার পথকে সুগম করেছিল, অপরদিকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থা আর এক নতুন পথ পেল। আর এই পথকে আরও মসৃণ করেছিল স্বদেশী আন্দোলন। তবে উনিশ শতকে বাংলায় আয়ুর্বেদের এই নবজাগরণ কিন্তু কখনওই সমালোচনার ঊর্দ্ধে ছিলনা। সুব্রত পাহাড়ী তাঁর *আধুনিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা* গ্রন্থে এই সীমাবদ্ধতার বেশ কিছু কারণের উল্লেখ করেছেন।[৪২] তাঁর মত অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, ১. সেই সময়ের কবিরাজ সম্প্রদায়ের মানুষরা কখনই মনে-প্রাণে চাইতেন না যে, বৈদ্য সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কোনো সম্প্রদায় আয়ুর্বেদচর্চা করুক। তাঁরা মনে করতেন, অন্য সম্প্রদায় পুরোপুরি আয়ুর্বেদ শিক্ষার পাঠ গ্রহণ না করেই নিজেরা নিজেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে রোগী দেখা শুরু করে দিতেন, যার ফলে আয়ুর্বেদের বদনাম হচ্ছিল। এক্ষেত্রে পেশাগত কবিরাজ সম্প্রদায় (যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে আয়ুর্বেদেরচর্চা করতেন) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কবিরাজ সম্প্রদায় (যাঁরা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে আয়ুর্বেদেরচর্চা করতেন)-এর মধ্যে মতবিরোধ হতো। এর মধ্যে কবিরাজদের নিজেদের জাত্যভিমান প্রকাশ পেয়েছিল। ২. গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে এত এত ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে ওষুধে ভেজাল দেওয়ার কথা শোনা যেতে লাগল। এর ফলে কবিরাজি ওষুধে কাজ না হওয়ায়, আয়ুর্বেদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ৩. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির সাহায্যে আয়ুর্বেদের সংস্কার করা নিয়ে কবিরাজদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। একদল মনে করতেন, আয়ুর্বেদ হলো ভগবান ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বাণী এবং তা মুনি ঋষিদের হাত ঘুরে আমাদের কাছে এসেছে। ফলে এর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অপরদিকে, আর একদল মনে করতেন পশ্চিমি চিকিৎসার পাশাপাশি এই চিকিৎসাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে শুধু শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। হাতে তুলে নিতে হবে আধুনিক যন্ত্রপাতি। গ্রহণ করতে হবে পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু অংশকেও, এতে আয়ুর্বেদের কোনো ক্ষতি হবে না। ৪. এই সময় আয়ুর্বেদের নানা শাখার উন্নতি হলেও জরুরি চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, রোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো উন্নতি ঘটেনি বলে সমালোচনা করা হয়। নবজাগরণের পরেও এইদিকগুলির জন্য সাহায্য নিতেই হয়েছিল পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের।

বিশ শতকের শুরুতেই আয়ুর্বেদ শিক্ষা আর টোল-পাঠশালার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। শুধুমাত্র বৈদ্য সম্প্রদায়ই যে এই চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, এই রীতিও আর রইল না। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম

আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাম ছিল 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়' (যার বর্তমান নাম যামিনীভূষণ রায় রাজ্য আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল)। পরবর্তী দু-দশকের মধ্যে আরও দুটি আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' (যার বর্তমান নাম ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাট শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ হাসপাতাল) এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়'। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হলো কারণ বর্তমানে আমাদের রাজ্যে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেই সরকারি উদ্যোগে আয়ুর্বেদ শিক্ষা এবং চিকিৎসা একসঙ্গে করা হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রকে যারা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরি ছিলেন আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য। অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। শৈশবে বাবার কাছেই তিনি প্রথম সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর দাদা ছিলেন কলকাতার স্বনামধন্য কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য (১৯০০-১৯৭১)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে, পরে আয়ুর্বেদ অধ্যায়ন করে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির আগ্রহে প্রথমে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ কলেজের অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে আমৃত্যু কলেজের অধ্যক্ষের পদে থেকেছিলেন বিজয়কালী ভট্টাচার্য।[৪৩] কলকাতায় এসে দাদার হাত ধরেই শিবকালী ভট্টাচার্যের মধ্যে আয়ুর্বেদের আগ্রহ জন্মায়। এই সময় দুই ভাই কিছুদিন অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তও ছিলেন। দাদার সঙ্গেই ঘোরাঘুরি করে গাছপালা নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে তিনি কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ছাত্র চন্দ্রকিশোর সেনের ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সি. কে. সেন অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড—এ কাজ করার সূত্রে থাকতেন টিটাগড়ে। পরবর্তীকালে তিনি কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিরাজ গণনাথ সেন ও কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেনের কাছে আয়ুর্বেদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৪ খ্রি. (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) তিনি 'আয়ুর্বেদশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতার মুচিপাড়ার কাছে ৯ নং ফাল্গুনী দাস লেনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। সকাল থেকে তিনি রোগী দেখতেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সবই তৈরি করতেন নিজের তৈরি করা সূত্রে। এক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করতেন হামলদিস্তা, বড়ো বড়ো উনুন, হাড়ি ও কড়াই। ওষুধের জন্য কাঁচামালের বেশিরভাগটাই আসত শিবপুর এবং সুন্দরবন থেকে। সুন্দরবনে নৌকায় চড়ে তিনি নিজেও বহুবার ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করেছেন। এখান থেকে তিনি সাপের বিষও সংগ্রহ করতেন এবং তা থেকে তৈরি করতেন 'অস্টিয়ো-আরথ্রাইটিস' নামে অব্যর্থ ওষুধ।[৪৪] পরবর্তীকালে সাপুরেরা তাঁর বাড়ি গিয়েও সাপের বিষ দিয়ে আসতেন। যদিও পরবর্তীকালে সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে এই ওষুধটি তৈরি করা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি নাড়ি দেখেই রোগীর প্রেসার বলে দিতে পারতেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি শ্যামাদাস শাস্ত্রী কলেজে আয়ুর্বেদ ভেষজের তিনটি প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন। রোগী দেখার পাশাপাশি তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ (জে. বি. রায় আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল) এবং শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্র পীঠে অধ্যাপনার পাশাপাশি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভেষজবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করেন। তিনি নিজেও এই সময় গভীরভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্র পীঠে আয়ুর্বেদের যে প্রদর্শনী হয়েছিল তার ভার গ্রহণ করেন এবং সুষ্ঠুভাবে তা সম্পাদনের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি State Faculty of Ayurveda Board থেকে আয়ুর্বেদাচার্য উপাধি লাভ করেন।[৪৫] *চিরঞ্জীব বনৌষধি* গ্রন্থের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছিলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *চিরঞ্জীব বনৌষধির* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নরসিংহ দাস' পুরস্কার প্রদান করা হয়।[৪৬]

তিনি নিজে বহু আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন আয়ুর্বেদচর্চা। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করে যাওয়া। তাঁর উইলেও একথার উল্লেখ আছে। তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে আয়ুর্বেদ কলেজগুলিতে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বহু পড়ুয়াকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বছরে শিশির মঞ্চে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত সূরের হাত থেকে এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় হিমানি, দেজ মেডিক্যালের ভূপেন দে-র মতো লোকজনেরা আসতেন তাঁর কাছ থেকে ওষুধের (চ্যবনপ্রাশ, চর্মরোগের ওষুধ) সূত্র লিখে নিয়ে যাওয়ার জন্য।[৪৭] এর জন্য তিনি কোনোদিনই কারও থেকে অর্থ নিতেন না। তিনি নেপাল, বেনারস-সহ ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাহাড়ি গাছ চিনতেন এবং সেই গাছ থেকে কীভাবে ওষুধ তৈরি করা যায় সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি যদি কিছুটা জমি পেতেন, তাহলে সেখানে বনৌষধি উদ্ভিদের একটি বাগান তৈরি করা। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে বারেবারে আবেদন করলেও তার কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন। গাছপালা নিয়ে চর্চা ছাড়াও তিনি চর্চা করেছিলেন জীবজন্তুদের নিয়ে। তাঁর *জীবজন্তুর নামরহস্য* বইটি এই কাজের সাক্ষ্য বহন করে। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মনেপ্রাণে স্বদেশী এই মানুষটি খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদরেই আজীবন কাটিয়ে গেছেন। সেই সময় বাংলার বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে গায়ক, উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক অনেকেই আসতেন তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। উদাহরণ হিসেবে রূপা গাঙ্গুলী, দেবশ্রী রায়, ছায়া দেবী, দীপঙ্কর দে, রাহুল দেব বর্মণ-সহ কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিকাশকলি বসু প্রমুখদের নাম জানা যায়।[৪৮] আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়াও তিনি প্রবাসী পত্রিকাতেও লিখেছেন। তাঁর নিজের লেখা ডাইরি, ব্যবহৃত জিনিসের বেশিরভাগটাই দান করা হয়েছে কাঁথির রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে স্বপনকুমার ভট্টাচার্য বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—এ আর্থিক অনুদান দিলে পরের বছর অর্থাৎ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' চালু হয়। এখনও পর্যন্ত সাতটি বক্তৃতামালার আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। এই স্মারক বক্তৃতার যাবতীয় তথ্য নীচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।[৪৯]

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

তারিখ	বক্তা	আলোচনার বিষয়	সভাপতি
৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১	ডা. শঙ্করকুমার নাথ	খাদ্যাভাস ও ক্যান্সার	রমাকান্ত চক্রবর্তী
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২	শঙ্করপ্রসাদ দে	মানবকল্যাণ ও জৈব রসায়ন	রমাকান্ত চক্রবর্তী
১৬ জুন, ২০১৩	ড. বাদল চন্দ্র জানা	বর্তমান বনৌষধি	বারিদবরণ ঘোষ
১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	আশীষ লাহিড়ী	ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানচিন্তা	বারিদবরণ ঘোষ
৪ জুন, ২০১৭	সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলকাতায় প্লেগ ও ভগিনী নিবেদিতা	বারিদবরণ ঘোষ
১ জুলাই, ২০১৮	মানসপ্রতিম দাস	বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস রচনার ধারা	নির্মলকুমার নাগ
১৯ জানুয়ারি, ২০২৫	অর্জুন দেব সেনশর্মা	গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ভোজনবিলাস—রুচিবৈপরীত্য, আয়ুর্দায়, সামাজিক দায়িত্ব ও শ্রেণিচেতনা	রতনকুমার নন্দী

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ (Central Council of Indian Medicine), ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে আয়ুষ মন্ত্রণালয় (Ministry of Ayush), ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কলকাতা (Central Ayurveda Research Institute, Kolkata) এবং রাজ্য

সরকারের উদ্যোগে আয়ুষ (Ayush in West Bengal) চালু করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই বর্তমানে সমগ্র দেশ তথা রাজ্য জুড়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাচ্ছে। ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সমগ্র দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি ছাতার কাজ করে চলেছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই সরাসরি দুই সরকারের সঙ্গে যুক্ত, ফলে তাদের মাধ্যমেই সরকারি তরফে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আয়ুষ বলতে আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি (AYUSH—Ayurveda, Yoga-Naturopathy, Unani, Siddha & Homeopathy) চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একসঙ্গে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গের আয়ুষ বিভাগের অধীনে বহু কলেজ ও হাসপাতাল আছে, যেগুলিতে আধুনিক পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, এই চিকিৎসাব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন বাংলার কবিরাজগণ। তাঁদের হাত ধরেই এই চিকিৎসাব্যবস্থা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এভাবেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসাব্যবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে আজও তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. শর্মা, সতীশচন্দ্র, (১৯০৪), *চরক সংহিতা,* কলকাতা, পৃ. ৫।
২. সেন, সত্যচরণ (সম্পা.), (১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দ), *আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকা,* কলকাতা, পৃ. ৭২।
৩. বসু, প্রদীপ (সম্পা.), (১৯৯৮), *সাময়িকী,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৭৫।
৪. চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ, (২০০৭), *ভেষজ চিকিৎসাপদ্ধতি ও পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৬।
৫. সেন, সত্যচরণ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭০।
৬. *তদেব।*
৭. *তদেব,* পৃ. ৭১।
৮. *তদেব,* পৃ. ৭২।
৯. *তদেব।*
১০. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, (২০১৪), প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ ও রসায়ন চিন্তা, সলিল সাহা, অসীম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা: দীপায়ন, পৃ. ৬৯।
১১. Hoernle, A. F. Rudolf, (1907). 'The Authorship of the Charaka Samhita', *Archiv für Geschichte der Medizin*, Bd.1, H.1, pp. 29-40।
১২. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (১৯৯২), *প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৩০।
১৩. *তদেব,* পৃ. ২২।
১৪. *তদেব,* পৃ. ২৫।
১৫. ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ, (২০১৭), *আয়ুর্বেদ পরিক্রমা,* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র, পৃ. ২৪।
১৬. পাহাড়ী, সুব্রত, (১৯৯৭), *উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ,* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৮।
১৭. *তদেব,* পৃ. ৮।
১৮. *তদেব,* পৃ. ৯।
১৯. *তদেব,* পৃ. ১০।
২০. *তদেব।*
২১. চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী এবং রাজবংশী, সুজিত, (২০২১), *ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, পৃ. ২৫।

২২. *তদেব,* পৃ. ১৮।
২৩. নাথ, ডা. শঙ্করকুমার, (২০১৪), *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩০।
২৪. পাহাড়ী, সুব্রত, (২০১৫), *আধুনিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা,* কলকাতা: রচয়িতা, পৃ. ১৪৮।
২৫. *তদেব।*
২৬. *তদেব,* পৃ. ১৪৭।
২৭. *তদেব,* পৃ. ১৪৯।
২৮. রায়, বিনয়ভূষণ, (২০০৫), *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস: উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব,* কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ. ৬৫।
২৯. সেন, সমরেন্দ্রনাথ, (১৯৫৫), *বিজ্ঞানের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন পব সায়েন্স, পৃ. ১১৭।
৩০. Chatterjee, Sabyasachi, 'Prafulla Chandra Ray (1861-1944): A Scientist who tried to make Science Social and to make Society Scientific', Chatterjee, Amitava, (2012), (Ed.), *People at Large: Culture in Modern Bengal*, Kolkata: Setu Prakashani, pp. 108-111।
৩১. পাহাড়ী, সুব্রত, (১৯৯৭), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬৮।
৩২. *তদেব।*
৩৩. *তদেব।*
৩৪. নাথ, ডা. শঙ্করকুমার, (২০১৪,) *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭৬।
৩৫. চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর, (১৩৭০ বঙ্গাব্দ), *আয়ুর্বেদের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৫৯।
৩৬. পাহাড়ী, সুব্রত, (২০১৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫১।
৩৭. *তদেব,* পৃ. ১৫৪।
৩৮. *তদেব,* পৃ. ১৫৭।
৩৯. পাহাড়ী, সুব্রত, (১৯৯৭), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৮৩।
৪০. পাহাড়ী, সুব্রত, (২০১৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৭৮।
৪১. *তদেব।*
৪২. *তদেব,* পৃ. ১৮৩।
৪৩. পাল, ড. নীরদবরণ, (২০১১), *ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ চর্চা,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১২১।
৪৪. দীপঙ্কর, ভট্টাচার্য, রবিবাসরীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ০৩.০৯.২০২৩।
৪৫. পাহাড়ী, সুব্রত, (২০১৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৭।
৪৬. পাল, ড. নীরদবরণ, (২০১১), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৫।
৪৭. কুণ্ডু, শুভঙ্কর, (২০২৫), 'উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায় পাঁচ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক', মণ্ডল, পলাশ (সম্পা.), *ইতিহাস এষণা* ৬, কলকাতা: বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা, পৃ. ১৩৮।
৪৮. সাক্ষাৎকার—চিত্রলেখা ভট্টাচার্য (শিবকালী ভট্টাচার্যের পুত্রবধূ)।
৪৯. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এবং সাক্ষাৎকার—তরুণ সরকার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মচারী)।